অসীমের একটি দিক রূপে, তাহলে দেহ হয়ে উঠতে পারে আধ্যাত্ম উপলব্ধির অঙ্গ।

ধর্মের প্রকৃতি (Nature of Religion):

শিশুকাল থেকে ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিকশিত হয়েছেন। তাই তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত চেতনায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিলই, পরবর্তীকালে হিন্দুত্বের কিছু বিষয়ও যুক্ত হয়েছিল। পরিণত বয়সে তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা আরো বিস্তার লাভ করে এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন 'মানবিক ধর্মে' যা 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম কখনও কোন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, উপজাতি, জাতি, রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষ ধর্মের বিশেষ একটা আকৃতিকে গ্রহণ করতে পারে নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা মতো, কিন্তু পরিণামে প্রকৃত ধর্ম সমস্ত বিশেষ আকৃতিকে অতিক্রম করে যায়।

'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে (ধর্ম পৃ৩৭) ধর্মের এই প্রকৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না, তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না; কেবলমাত্র, জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

Scanned by CamScanner

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র। তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা; তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া, আমাদের অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল।

যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা, পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক একজন অধ্যবসায়ী এক এক নতুন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে, আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।"

রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় সংগঠনগুলি কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়েছে। ধর্মের মূল জীবনীশক্তিকে এই সংগঠনগুলি উপেক্ষ করে তার জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করেছে কৃত্রিম ধার্মিকতায়। প্রকৃত ধর্ম প্রচার করে স্বাধীনতা, আর ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধর্মকে করে তোলে তাদের সংগঠনের ভৃত্য।

'ধর্ম' গ্রন্থের 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে (পৃ ৭৬) তিনি এ প্রসঙ্গে বলছেন:

"... ধর্মও যখন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্থ অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে - আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

Scanned by CamScanner

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশঃই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া ওঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে।"

রবীন্দ্র-দর্শনে ধর্ম ও দর্শনকে পৃথক করা সমস্যা বিশেষ। দুই-এরই লক্ষ্য এক। দর্শন হল 'সত্যের দৃষ্টি' (Vision of the real) আর ধর্মের লক্ষ্য হল মানব মনে ঐশ্বরিকতার সঙ্গে একত্বের উপলব্ধি। উভয়েই এক এবং অভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করছে। তবে এই 'নিজের সত্যপ্রকৃতির উপলব্ধি' ঐশ্বরিকতার সঙ্গে 'আত্মার একত্ব' ইত্যাদি বিষয়গুলি বিমূর্ত। অবান্তর বচনের অপব্যাখ্যা যাতে না হয় তার জন্য তিনি নির্দেশ করছেন ধর্মে 'ভালোবাসা'র কথা। অসীমের উপলব্ধি হঠাৎ করে হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের শুরু করতে হবে ভালবাসা দিয়ে। আমাদের জীবন সম্পর্কে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির, আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারে অপরের প্রতি ভালবাসা। বিশ্বপ্রকৃতির সকল প্রাণী, লতা, বৃক্ষ নদী, প্রান্তরের প্রতি মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধই তার মধ্যে জন্ম দেবে এক বিশ্বব্যাপী একত্বের, এক বিশ্বজনীন ধর্মের।

ভালবাসা, ত্যাগ, আন্তরিকতা এবং সরলতা এই দিয়েই তৈরী হয় প্রকৃত ধার্মিকের জীবন। রবীন্দ্রনাথ 'নিষ্পাপ ভালবাসা'র শক্তিতে এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তিনি বলেছেন, সাংগঠনিক ধর্মের প্রয়োজনীয় জ্ঞান—ধর্মকেই ধ্বংস করে দেয়। উপমা দিয়ে তিনি বলছেন : পবিত্র মন্দির থেকে শিশুরা ছুটে পালিয়ে গিয়ে ধূলায় বসে খেলছে, ঈশ্বর ঐ শিশুদের খেলা লক্ষ্য করছেন — পুরোহিতদের ভুলে গিয়েছেন।

মানব অভীষ্ট (Human Destiny):

রবীন্দ্রনাথের মতে, চরম মানব অভীষ্ট হল একত্বের অনুভূতি, দিব্য উপলব্ধি, চরম ভালবাসা এবং নিজের মধ্যে বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধির প্রকৃতি কি? এই উপলব্ধি কি মানুষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে তোলে আগের অবস্থা থেকে ? বিশাল এক এর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি সম্পূর্ণ নিজেকে হারিয়ে ফেলে? এটা কি কেবলমাত্র একটা যন্ত্রণাহীন নঞর্থক অবস্থা? এরকম নানা প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় ততক্ষণ জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণই থেকে যায় এমনকি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের পরিণতিই বা কি সে সম্পর্কেও সন্দেহ থেকে যায়।

আমাদের স্বাভাবিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি হয় মৃত্যুতে একথা আমাদের সকলেই জানা। আমরা এও জানি না তারপর কি হয়! এ কারণেই জড়বাদী এবং প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন মৃত্যুই জীবনের চরম পরিসমাপ্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, মৃত্যু-জীবনের শেষ পরিণতি নয়। এমনকি মৃত্যু জীবনের নাস্তিত্বও নয়, মৃত্যু জীবনের এক সদর্থক দিক-, যা জীবনকে এক আলাদা মাত্রা দেয়। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কারণ মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, অজ্ঞতাবশতঃ সে মনে করে জীবনের শেষ কথা হল মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুকে যদি যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে জীবনের এক দিশা খুঁজে পাবো আমরা। কবির মতে, মৃত্যু আর এক মানবিক এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য পূরণ করে আমাদের জীবনে। মানুষ 'নিজের'

Scanned by CamScanner

বলে যা কিছুকে মনে করে, তার পরিসমাপ্তি ঘটায় মৃত্যু। এভাবে মৃত্যু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের চেতনার বিস্তার ঘটিয়ে। এভাবে মৃত্যুকে বলা যায় 'এই জীবন' এর পরিসমাপ্তি, কিন্তু এটাই মানব অভীষ্ট নয়। বরং এটা একটা অধ্যায় মাত্র।

এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পুনর্জন্মে। বেদ-আশ্রয়ী সকল দর্শনগুলিই বিশ্বাস করে আত্মা জন্মচক্রের মধ্য দিয়ে পুনঃজন্ম লাভ করে করে বিকশিত হয়। প্রত্যেকটি জন্ম এক একটি অধ্যায়, এবং সেই অধ্যায়টি নির্ধারিত হয় তার পূর্ববর্তী জন্মের প্রবণতা এবং কর্মদ্বারা। রবীন্দ্রনাথ পুনর্জন্মের এই সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন এ সবই বৃথা। তবে তিনি একথা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে এবং তার চরম অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে যতক্ষণ না পারছে ততক্ষণ জীবিত থাকে। গীতাঞ্জলির কবিতার মধ্যে তিনি একথা বলেছেনও।

তাই পুনর্জন্মকেও তিনি মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে, পুনর্জন্ম হল একটা পর্যায়, যার মধ্য দিয়ে আত্মাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। চরম অভীষ্ট হল অমরতার উপলব্ধি, পরিপূর্ণ মুক্তি। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতি ঘটে বন্ধন থেকে মুক্তিতে। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ থাকে বন্ধন-কেননা ততক্ষণ আমাদের শক্তি নির্ধারিত হয় দেহের দ্বারা। কিন্তু যখন দেহের বন্ধন ছাড়িয়ে আমরা আত্মার শক্তিতে ও স্বাধীনতায় বিকশিত হতে থাকি, তখন উপলব্ধি করি, আমাদের সকলের সঙ্গে অনিবার্য যোগসূত্রের কথা, আমরা অমরতার দিকে অগ্রসর হই, আমরা পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ লাভ করি।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে (পৃ.৯৫) এই উপলব্ধির কথা তিনি কাব্যিক ভাষায় বলেছেন এভাবে: "দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষের জলভার নত মেঘ। নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটি অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করেছি, যা ভোগ করছি, চার দিকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখ-দুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে - এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যেসব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন। ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন করে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া

Scanned by CamScanner

গেল। এষোহস্য পরম আনন্দঃ। আমার মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে'র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।"

কবির এই উপলব্ধি থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মানুষ চরম অভীষ্টে হঠাৎ করে পৌঁছিয়ে গেলে নিজেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে আবিষ্কার করে না। বস্তুতঃ যখন কেউ বিশ্বআত্মাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে, তার পরিবর্তন দেখা দেয় অন্তর জগতে। এই পরিবর্তন ঘটে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যান্য মানুষ-জীব —সকল প্রাণীকে দেখার ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তাই এই স্বাধীন মানুষ—একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিবর্তন হয় না। বরং তাঁর আত্ম-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সকল বিষয়ের প্রতি এক মমত্ববোধ এবং আনন্দের সৃষ্টি হয়। সে প্রবেশ করে আনন্দের এমন 'সাগর'এ—যে সাগরের কোন সীমা বা উপকূল নেই।

কবি তাঁর সাধনা নামক ইংরাজী গ্রন্থে (পৃ.১৬২) এ প্রসঙ্গে বলছেন, "Where is the further shore? Is it something else than what we have? Is it somewhere else than where we are? Is it to take rest from all our works, to be relieved of all the responsibilities of life? No; in the very heart of our activities we are seeking for our end. We are crying for the across, even where we stand."

আনন্দ সাগরের এই উপমা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মানুষ তার চরম অভীষ্ট লাভের পরও নিজের বিশিষ্ট অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল। এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বিতর্ক রয়েছে। কিছু ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে 'এক' এর মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি মানুষ আপন সত্তাকে হারিয়ে ফেলে - এটাই তার চরম নিয়তি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনও কখনও এমনভাবে কথা বলেছেন যাতে মনে হবে যে, ব্যক্তি মানুষের চরম অভীষ্ট ব্রহ্মের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এজাতীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ জাতীয় তত্ত্বকে তিনি 'ধর্ম' (Religion) বলতেও রাজী নন। তাঁর মতে — মানুষ হিসাবেই তারা সম্পূর্ণ—অসীমের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার থেকে।

ভারতীয় দর্শনে 'মুক্তি' বলতে বোঝায় পুর্নজন্মের প্রবণতা থেকেও মুক্তি। কিন্তু কবির চিন্তায় — এজাতীয় ধারণা মানব ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই তিনি বলছেন এর কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্যার তিনি এক ভিন্ন সমাধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, মুক্ত অবস্থায় মানুষ এবং ঈশ্বর পরস্পর আনন্দ খেলার সাথী। যেমনভাবে খুশি তাঁরা এই খেলা খেলতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় তবে আত্মা পুনরায় জগতের আনন্দে খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য আবার জন্ম নিতে পারে। তাই আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না কিভাবে এই খেলাটা খেলবে মানুষ।

Scanned by CamScanner